বীরভূমের শ্মশানচারণা

আবীর কর

মোরা এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক ফুল ও ফল
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশান ঠাঁই।
(হিন্দু মুসলমান / কাজী নজল ইসলাম)
আগেকার দিনের মা পিসীমার সূচিশিল্পে বা আজকের বাসট্রাকের পিছনে লেখা অসংখ্য আপ্তবাক্যের একটি পরিচিত লাইন 'সুখ স্বপনে / শান্তি শ্মশানে''। উদ্ধৃতিটি নিদাণ সত্য, কালের কষ্টিপাথরে যাচাই করা সত্য। সেই কথা মনে রেখে আমরা বীরভূমের শ্মশানে পরিক্রমা শু করতে পারি।

১. তারাপীঠ / বামাক্ষেপার শ্মশান ঃ
দ্বারকা নদীর তীরে ৪ কি.মি. শব মুণ্ডাস্থি বহুল মহাশ্মশান ---একদা ঘন জম্বু বৃক্ষপূর্ণ ও জম্বুকের নিঃশঙ্ক বিহারস্থল। ১২২৫ সালে লক্ষ মুদ্রা নির্মিত মন্দির। রাজা রামকৃষ্ণ প্রদত্ত ও নাটোর রাজ সরকার প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির অর্থে ব্যয় নির্বাহ হয়। এখানকার দেবী তারিণী এবং ভৈরব - উন্মত্ত।

তারাপীঠকে কেন্দ্র করে শ্মশান, না শ্মশানকে কেন্দ্র করে তারাপীঠ। এ প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত শ্মশানচারীরা। ছোট ছোটখাপরার বেড়া দেওয়া ঘরে যারা দীর্ঘ কাল শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কাটিয়ে এসেছেন, সেই সব অতিমানুষদের বক্তব্যের সরলীকরণে দাঁড়ায় বহুকাল আগে এক রানীমা স্বপ্নাদেশে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তার আগে এই সাল নদীর (স্থানীয় নাম) ধারে জলাজঙ্গলের মধ্যে ছিল শ্মশান । রানীমা ছিলেন বামাক্ষেপার গু (বাবা)র সমসাময়িক। বালকবামক্ষেপার দৌরাত্ম্য নিয়ে প্রচুর গল্প আজও শ্মশানমুগ্ধ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। বালক বামাক্ষেপার দুরন্তপনায়অতিষ্ট হয়ে মন্দিরের পুরোহিতরা তাকে মারধোর করে প্রায়শই তাড়িয়ে দিত, একমনকি একসময় তাঁর মন্দির চত্বরে প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়। সেই সময় থেকে সে শ্মশানচারী বালক বামাক্ষেপা।শ্মশানের কাছেই একটি বেলগাছের তলে তাঁর বাস ছিল। বেল গাছটি আজও বর্তমান এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে বাঁধানো।

সেই সময় রানীমা বালক বামার মধ্যে বেশ কিছু অলৌকিক বিষয় লক্ষ্য করেন। যেমন তারাপুর গ্রাম (শোনা যায় এই গ্রামের নামই পরবর্তীকালে তারাপীঠ) থেকে রাণীমা কোনো এক সময় ঘোড়ার গাড়ি করে বৃন্দাবন পৌঁছে দেখেন বালক বামা পায়ে হেঁটে তার অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে তার জন্য অপেক্ষায় আছে। রানীমা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতদের বিদ্ধে বামা তার অভিযোগ শুনিয়েছে এবং মারধোরের দৃষ্টান্তও প্রত্যক্ষ করিয়েছে । রানীমা তাকে আশ্বস্ত করে তারাপুরে ফেরার অনুরোধ করেন। রানীমা ঘোড়ার গাড়ি করে এবং অন্যদিকে একগুঁয়ে বালক বামা পায়ে হেঁটে বৃন্দাবন

থেকে রওনা হয়। বলাইবাহুল্য য়ে রানীমার অনেক আগেই বামা তারাপীঠে পৌঁছে যায়। রানীমা ফিরে মন্দিরে পুরো হিতদের নির্দেশ করে বলেন, যে বামার জন্য মন্দিরের দ্বার সর্বদা খোলা থাকবে। তারপর থেকে বামাক্ষেপার জীবনের নব-অধ্যায় । তবে, তারাপীঠের মা তারা মন্দিরের চেয়ে, বামাক্ষেপার বহুল মাহাত্ম্য ছড়িয়ে আছে তারাপীঠের শ্মশানে। এমনকি শ্মশানটি তারাপীঠের শ্মশান অপেক্ষা বেশি পরিচিত বামাক্ষেপার শ্মশান নামে।

নদীর চরে অনেকদূর বিস্তৃত শ্মশানজমি। এখানকার তান্ত্রিক, কাপালিকরা এই সাল নদীর তীরে শ্মশান ভূমিতে দীর্ঘকাল ব াস করছেন। দীর্ঘকালের চিতার আগুনে ঝলসানো তাদের জীবনদর্শন। সাধারণ মানুষের আওতার বাইরে তাদের অভিজ্ঞ জগত। অপরিমিত মাদক সেবনে তাদের শরীরী ভাষা ভিন্ন গোত্রের। শয়নে বসনে এবং খাদ্য নির্বাচনে তারা অন্যলোকের বাসিন্দা। চোখের সামনে সর্বদা চিতা জ্বলছেই। প্রাণহীন রক্ত মাংসের শরীর পুড়ে দুমড়ে মুচড়ে ছাই হয়ে য াওয়ার দৃশ্য তাদের অতীব পরিচিত । চিতার ছাই উড়ে বেড়ায় চারপাশে, দরমার বেড়া দেওয়ার খলপার ঘরে বিক্ষিপ্ত ছড়ানো কঙ্কালের টুকরো। মড়া পোড়ানো কাঠই তাদের নিত্যব্যবহার্য জ্বালানি। চিতার আগুনের একপাশে চায়ের কেটলি চাপিয়ে তারা যখন উষ্ণ পানীয় এগিয়ে দেন, তখন যে কোনো দুর্বলচিত্ত মানুষের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কী।

বামাক্ষেপার মূল শ্মশান জমিটি বিঘা পাঁচেক নদীর চর জুড়ে ছড়িয়ে আছে। অদুরেই বামাক্ষেপার মন্দির, বা বামাদেবের মন্দির নামেই পরিচিত। বামাক্ষেপার একটি পাষাণমূর্তি সেখানে নিত্যপূজা পায়। শ্মশানচারীরা সাধু সন্ন্যাসী বিশ্লেষণের চেয়ে বামার চ্যাল্য'(২) নামে বেশি পরিচিত এবং এ নামে ডাকলে তারা খুশি হয়। বাস্তবিকই তারা বামার চ্যালা, মৃতদেহের পরিবারকে সাহায্য করতে তারা সর্বদা প্রস্তুত । মৃতদেহের শুদ্ধিকরণ, চিতা সাজানো, মড়া পোড়ানো, না ভিকুণ্ড উদ্ধার সবকিছুতেই তারা সিদ্ধহস্ত। বিনিময় ইচ্ছাদান। কোনো দাবি নেই। নেই কোনো শ্মশানঘাটে জমা। এমনকি দুঃস্থ মৃতদেহ সৎকারে বামার চ্যালাদেরই চিতার খরচ বহন করতে হয়। বামাক্ষেপার শ্মশানে চারটি স্থায়ী চুল্লি বর্তমান । বহু আগে এখানে দুটি মাত্র বিল (৪) ছিল। আলাদা করে কোন ডোমের ব্যবস্থা নেই। মৃতদেহ দাহভার তার পরিবার পরিজনকেই নিতে হয়, তবে বামা বাহিনীকে প্রায়শই নিতে হয় মুশকিল আসানের গুভার। এখানে বৈদুতিক চুল্লির দাবি দীর্ঘদিনের (দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় (২১.১২০(৩) একটিসংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।) তবে বামার দলের বেশ কিছু চ্যালার বক্তব্য কাঠের চিতা সাজানো এবং মড়াক উপরকাঠের ভারি (৫) চাপানোর মধ্য দিয়ে সর্বে াপরি সম্পূর্ণ শয্যা (৬) নির্মাণে আত্মীয় স্বজনের স্বহস্ত যেভাবে কথা বলে উঠে, বৈদ্যুতিক চুল্লির পক্ষে সেটা কী সম্ভব হবে। বাস্তবিক ভাববার আছে।

সমগ্র শ্মশানভূমি এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যে মোড়া । চারিদিকে মড়া পোড়ানো আধপোড়া কাঠ, ছাইয়ের গাদা, ভাঙা হাঁড়ি, ব াঁশের ছড়াছড়ি। এক চিতার আগুন নিভতে না নিভতে, আর এক চিতার আগুন ধরে। এক হরিধবনির রেশ কাটতে না ক াটতে আর এক হরিধবনি আছড়ে পড়ে শ্মশান ভূমিতে, ছড়িয়ে পড়ে সাদা খই।

সম্পাদকের সংযোজন ঃ কালে কালে তারাপীঠের বিবর্তন হয়েছে। সে এক ভিন্ন ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয় তারাপীঠের শ্মশান। তারাপুর - চণ্ডীপুর এই অঞ্চলেই তারাপীঠ। বশিষ্ঠমুনি বুদ্ধরূপী জনার্দনের দৈববাণী পেয়ে তারাপীঠে এসে সিদ্ধিলাভ করেন এরূপ কথা, মহাচীনাচার, তন্ত্রে লেখা আছে। তারপীঠের দেবী শিলাময়ী। শিবকে স্তন্যদানরতা ত ারা মাতৃমূর্তি এটি। সে সব অন্য প্রসঙ্গ। বশিষ্ঠ সিদ্ধিলাভের পর পদব্রজে হুগলী জেলার মহানদ পবিত্র তীর্থে গিয়েছিলেন এমন কথা লিখিত আছে। জয়দত্ত বনিককে নিয়ে কিংবদন্তিও আছে। তারাপীঠের জীয়ৎ কুণ্ডতে স্নান করালে মৃত মানুষও জীবিত হয়ে ওঠে। দ্বারকা নদীর তীরে একসময় ছিল আড়াই -তিন মাইল ব্যাপী নানা বৃক্ষে আচ্ছাদিত মহাশ্মশান । দিনের বেলাতেও মানুষ যেতে ভয় করত। এই ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমিতে তান্ত্রিক --- সাধকেরা বীরাচার তন্ত্রের সাধনা করেন। বশিষ্ঠের সাধনাস্থল ----শিমূলতলা মহাশ্মশানে বশিষ্ঠের আরাধিতা তারামার মন্দির যেখানে ছিল সেই পুণ্যস্থানে বর্তম

ানে একটি ছোট মন্দির ও দেবীপদ চিহ্ খোদিত এক শিলা রয়েছে। মন্দিরের উপর লেখা আছে---
জয় মা তারা
ও
শিমূলতলা, ব্রহ্মার মানসপুত্র মহামুনি বশিষ্ঠের যোগাসন
(পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালী ক্ষেত্র ঃ দীপ্তিময় রায়)
বোঝা যাচ্ছে বর্তমান তারাপীঠের মন্দিরটি আধুনিক কালের। জয়দত্ত কৃত তারামার মহাশ্মশান আজ আর নেই। বশিষ্ঠের প্রাপ্ত মূর্তিটি কালো কষ্টিপাথরের। তারামার সাজপরানো, বর্তমান দেবী বিগ্রহের পশ্চাতে রাখা আছে। ১২৬৪ বঙ্গাব্দে বর্তমান তারাপীঠ শ্মশানে এসেছিলেন সাধক কৈলাসপতি । সঙ্গে ছিল---ভৈরবী, চারপাশে নরকঙ্কাল ছড়ানো, শিয়াল, শকুন ----সব মিলিয়ে ভয়ংকর পরিবেশ। তারাপীঠের যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন আনন্দনাথ, মোক্ষদ ানন্দ, বিশে ক্ষেপা জটাম, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, মণি গোস্বামী, থাকিয়া বাবা, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।তবে যে সিদ্ধ স াধকের জন্য তারাপীঠের এত খ্যাতি তিনি স্বয়ং বামা ক্ষেপা তারাপীঠের শ্মশানের একটু বর্ণনা ঃ

"দারকানদীর কোলে শ্মশান। আজও অসংখ্য শব মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়, দাহ করা হয় না। শৃগাল শকুনির লীল াক্ষেত্র এবং তান্ত্রিক সাধকের । পীঠের সীমানার মধ্যে চারিদিকে ছড়ানো পর্ণকুটির, আর কিছু আশ্রম। কোন প্রকৃত তা ন্ত্রিক সাধক এখন আর তারাপীঠে নেই পাণ্ডারা বলেন। ... আগাগোড়া নরমুণ্ড কঙ্কাল দিয়ে তৈরি কুটির সাধুরা বাস করেন। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য (বর্তমানে নরমুণ্ডকুটীর নেই)। মাটির দেয়ালে অজস্র নরমুণ্ডু গাঁথা । দরজায় নরমুণ্ড, স ামনের প্রাঙ্গণে বৃত্তাকারে আলপনার মতো মুণ্ড বসানো।"
(পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ঃ প্রথম খন্ড।)
২. কংকালীতলা / সিংহবাহিনী মহাশ্মশান ঘাট ঃ
একান্নপীঠের একপীঠ কংকালীতলা। যেখাণে একটি কুণ্ডে ৭ মায়ের কঙ্কাল প্রোথিত আছে বলে বিশ্বাস। দেবী বেদগর্ভা, ভৈরব - । কুণ্ডের কাছে কালীমন্দির, মন্দির সংলগ্ন সুসজ্জিত নাটমন্দির। মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পটমূর্তি। যেখানে নিত্যসেবা পুজো হয়। এছাড়া মঙ্গলবার, শনিবার বিশেষ পূজা হয় অর্থাৎ মানত ৮ বা মানত পূরণের পূজা হয়। পীঠস্থ ানের দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল তা লোপ পায়। অতঃপর তালতোড় গ্রামের ঘোষবাবুরা ধরণীধর কঙ্কালী ট্রাস্ট স্টেট গড়ে দেবী পূজার ব্যবস্থা করেন।

কাংকালীতলা মন্দিরের অদুরেই মা কংকালীর মহাশ্মশান ঘাট যার প্রকৃত নাম সিংহবাহিনী মহাশ্মশানঘাট। এখানকার সিংহবাহিনী শ্মশানঘাট আশ্রমকে কেন্দ্র করে অদিত্যপুর গ্রামের দাস পরিবারের তিন পুষ কেটে গেছে। বর্তমানে মহাশ্মশ ানের দেখভালের ভার মদনদাসের উপর। তার বাবা শিবরাম দাস এবং তার বাবা সুরেন্দ্রনাথ দাস এই সিংহবাহিনী শ্মশ ানঘাট আশ্রমের দায়িত্বে ছিলেন। মূল শ্মশান কমিটি বিঘা খানেক (২২ কাঠা)। কোনোরকম যাত্রীচালা বা ছাউনি নেই। অ াশ্রম নামে যে কুটিরখানি আছে, ঝড়জলের সময় শবদাহীদের কাছে তাই আশ্রয়।দিবিজেন্দ্রস্মৃতি পান্থনিবাস ---শ্রীযুক্তা অনুপমা রায় কর্তৃক স্থাপিত। ১৩১১, ২২ বৈশাখ ১৯০৪ ফলক যুক্ত একটি পুরানো ছাউনি বর্তমান। ১৪০৯ বঙ্গাব্দে স্থা পিত নেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্মশানকালীর একটি পুজাঘর নির্মাণ করেন। দুটি পাকা চুল্লি এবং দুটি কাঁচা চুল্লি মিলে মোট চারটি চুল্লি। চুল্লিতে মৃতদেহ চাপানোর আগে মা কংকালীর গান বা শ্মশানকালী ঘরের চালায় মূখাগ্নি করতে হয়। মৃতদেহের পরিবার পরিজনরা মৃতদাহ সৎকার করেন। এছাড়াও সিংহবাহিনী শ্মশানঘ াটে পাটুনির (৮) কাজ করে মন্টু ডোম । যার মড়া পিছু কোন নির্দিষ্ট দাবি নেই। বিনিময়ের প্রশ্ন সে বলে--- পাকা মড়ায় শাল পাই, কাঁচা মড়ায় গাল খাই "(৯) গলায় এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততা।

সমগ্র সিংহবাহিনী শ্মশানভূমির উপর দু'শতাধিক সমাধি ফলক রয়েছে। বেশ কিছুস্থলে শুধুমাত্র খুঁটিপোতা । সমগ্র শ্মশ ানটিকে কনুইমোড়া করে রেখেছে কোপাই উত্তরবাহিনী নদী। যার কোলে ছিল আদি জিল অর্থাৎ প্রথম শ্মশান। পরে তা

সরে এসে শুকনো জায়গা অধিকার করে বসেছে । দু একজন আনুকূল্যে শ্মশান সংস্কারের কাজ চললেও কোনরকম পঞ্চায়েতী সাহায্য নেই। জাতপাতহীন এই সর্বজনের সিংহবাহিনী শ্মশানে কোনরকম শ্মশানঘাটের জমা লাগে না। সর্বানন্দপুর, কলহরপুর, কাপাসটিকরি, বিপ্রটিকুরি, আদিত্যপুর ছাড়াও বহু দূর দূরান্তের মৃতদেহ নিয়ে আসেন তার আত্মীয় স্বজনেরা আত্মার শান্তি কামনায়। প্রতি মাসে ত্রিশ - চল্লিশটি শবদাহ হয়। প্রতি বছর চৈত্রসংক্রান্ততে বসে মা কংকালীর মেলা, যদিও তার সঙ্গে সিংহবাহিনী শ্মশান চত্বরের কোন ঘনিষ্ঠ যোগ নেই।

মা কংকালীর মন্দির এবং মন্দির সংলগ্ন অংশ অনেক ভক্তজনের সেবাহস্ত পেয়েছে কিন্তু উপেক্ষিত থেকেছে সিংহবাহিনী শ্মশানভূমি । যদিও এই উপেক্ষায় উদাসীন মন্টু ডোম বা বাবুয়ার মত মানুষজন ঘর জিজ্ঞেস করলে উত্তর মেলে "কেন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানেই ঘর।" তারপরই চুল্লির মাথার সিঁদুর দেয়, ফুলও দেয় ১০। শ্মশানকালীর সঙ্গে সঙ্গে নিত্যদিন চুল্লিও পুজো পায়। মড়াপোড়ার ধোঁওয়ায় কালো স্তর জমা হতে থাকে পুরানো পান্থনিবাসটিতে । তবুও চুন - সুরকির দেওয়ালে চারকোন দিয়ে লেখা কত প্রিয়জনের প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, প্রতিহিংসার কথাগুলি ১১ স্পষ্ট পড়া যায়। যে স্পষ্ট কথায় পিছনে লুকিয়ে আছে কোনো স্পষ্টতর সত্য ঘটনা। শুধুমাত্র উদ্‌ঘাটনের অপেক্ষায়।

৩. শান্তিনিকেতন / চাঁদের শ্মশান ঃ

শান্তিনিকেতন চাঁদের শ্মশান নামে যেটি সুপরিচিত, সেই শ্মশানের আগে নাম ছিল দিগন্তপল্লি, আমানিডোবা শ্মশানভূমি। তালতোড়ের বাবুরা রবীন্দ্রনাথকে যে জমি দান করেন, সেই জমিরই এক টুকরো হল এই শ্মশানভূমি। বছর ষাটেক আগে এই বিঘা দেড়েক জমি ছিল জলাজঙ্গলে পূর্ণ। বোলপুরের বীরেন সেনের দায়িত্ব ছিল এই জমি। ১৯৭৮ -এর বন্যার পর চাঁদ দাঁ তার গুসকরার বসতবাড়ি ছেলে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। আপনভোলা, আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মানুষটির মন জাঁকিয়ে বসে ঐ দিগন্তপল্লি আমানিডোবা শ্মশানভূমিতে। তারপর থেকে ঐ শিকড়হীন মানুষটির নিরলস চেষ্টার ফসল আজকের চাঁদের শ্মশান। ১৯৯৮ এর ২১ আগস্ট চাঁদ দাঁ শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্তমানে চাঁদের শ্মশানের দায়িত্ব আছেন তার স্ত্রী টগর দাঁ, এবং তাকে সাহায্য করেন মেয়ে জামাই কবরী ও সৌমেন, আর চাঁদ দাঁর বেশ কিছু চ্যালা। চ্যালাদের চোখে চাঁদ দাঁ গুদেব। প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে চাঁদের হাতেই প্রতিষ্ঠিত শ্মশানকালীর পাশেই আজ চাঁদ দাঁর ছবিও পূজিত হয়।

দিগন্তপল্লি আমানিডোবা শ্মশানটিকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে তুলতে চাঁদ দাঁ তৎকালীন বিশ্বভারতীর আচার্য রাজীব গান্ধীর কাছেও আবেদনপত্র পাঠিয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ (এস. এস. ডি. এ.)--এর কাছে বহুবার যাতায়াত। (এস. এস. ডি. এ.)-এর আনুকূল্যে একটি চুল্লি, একটি বিশ্রামাগার এবং শ্মশান কমিটিকে এক নির্দিষ্ট প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রয়াত চাঁদ দাঁ। যদিও এখনও বিদ্যুতের অভাব এবং জল সরবরাহের অব্যবস্থায় ক্ষোভ রয়েছে টগর দাঁ সহ অন্যান্যদের।

অন্যান্য শ্মশানের পাশাপাশি চাঁদের শ্মশান একটু ভিন্ন গোত্রের। নিখুঁত সাজ - সজ্জাই একে সাবেকি শ্মশান থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিয়েছে। শ্মশানকালীর মন্দির এবং মন্দির সংলগ্ন উঠোন এক আশ্চর্য মমতায় নিকানো, আবর্জনার বালাই নেই। একটিমাত্র চুল্লি এই বিশিষ্ট শ্মশানে, প্রয়োজনে একটি অস্থায়ী চুল্লি নির্মাণের ব্যবস্থা বর্তমান। ফুলডাঙ্গা, গোয়ালপাড়া, কমলাকান্তপুর, শান্তিনিকেতন, মকরম্‌পুর থেকে মড়া পোড়ানোর জন্য মানুষ এসে দাঁড়ায় এই চাঁদের শ্মশানে। গোয়ালপাড়া ধনিকতলা নামে একটি শ্মশান থাকলেও সেখানকার মানুষও মৃতদেহ সৎকারে এই চাঁদের শ্মশানের উপর নির্ভরশীল। আর চাঁদের শ্মশানের উপর নির্ভর করে থাকা একটি পরিবার, দিনরাত অনেক প্রতিশ্রুতি শুনে, আজ ক্লান্ত। শুধুমাত্র ভরসা ঐ শ্মশানঘাট জমা শ' খানেক টাকা। তাও যখন সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, তখন মানবিক ঐশ্বর্যে এগিয়ে আসেন বীরেন মাহাতোর মত মানুষেরা। ডোমের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়ে সৎকার করেন, আর বিড়বিড় করে গুদেব চাঁদ দাঁর স্মরণ নেন। অজ্ঞাতবাস থেকে গুদেব কী বলেন না সাধু সাধু ?

৪. সুল / কালীসায়ের মহাশ্মশান ঃ

সুল কালীসায়ের মহাশ্মশান সুল গ্রামের সমবয়সী। সুল সরকারী বাড়ির বিশ্বনাথ সরকার এবং কৃষ্ণসাধন সরকার মহাশয়ের ভাষায় প্রায় তিনশো বৎসরাধিক বয়স মহাশ্মশানের । মহাশ্মশানের পরিমান ১ একর ২৭ শতক অর্থাৎ সাড়ে তিন বিঘার বেশি। কালিসায়ের মহাকালীর মন্দির, কালিসায়ের সহ মহাশ্মশানের সমগ্র কমিটিই সুল সরকার বাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কালীসায়েরর মহাকালী পাষাণরূপী। জনশ্রুতি আছে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কালে রেললাইন খননকার্যে এসে বর্তমান কালীসায়েরের কাছে এসে খননকারীরা বাধা পায় একটি রহস্যময় পাথরের (১২) অবস্থানজনিত কারণে। এরপর রেললাইনের নির্ধাধিত পথ যায় পাল্টে- এবং উক্ত পাষাণটি মা কালীর মর্যাদায় পুজিত হয়। যদিও এর সঙ্গে পটের কালীমূর্তি বর্তমান । তবে মহাশ্মশানের বিশেষ ঐতিহ্য। বহুকাল আগে যখন মহাশ্মশানের জায়গাটি বরষার ডাঙ্গা নামে পরিচিত ছিল তখন থেকেই এ নিয়মই বহাল আছে। যেমন নিয়ম আছে সুল গ্রামে ঢোকার মুখে আদি পুকুরের উত্তরপাড়ে প্রথমে মুখাগ্নি এবং শুদ্ধিকরণ জাতীয় পর্ব শেষে মরদেহের সৎকারের জন্য মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদেহ সৎকারের জন্য কোনোরূপ শ্মশানঘাটজমা লাগে না, এমনকি সর্বদা সরকার বাড়িত অনুমতিও লাগে না। তবে মহাশ্মশানে সংরক্ষণ বা উন্নতি প্রকল্পেকিছু পদক্ষেপ নিতে গেলে অবশ্যই সরকারবাড়িতে অনুমতি প্রয়োজন। এ বাবৎ মহাশ্মশানে প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে একটি শবযাত্রী ছাউনি হয়েছে। আর রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দাক্ষিণ্যে একটি নলকূপ বসেছে।

আগেকার বরষার ডাঙ্গা এবং এখনকার বিনয় ভবনের মাঠ সংলগ্ন সুল কালীসায়ের মহাশ্মশামান উচচ-নীচ সবার সর্বদা খোলা। শান্তিনিকেতন সুল মূল রাস্তার পাশে শ্মশান অবস্থানের কারণে দূষণের অভিযোগ এসেছে দু'একবার। চিতার ধোঁয়া, ছাই এড়ানোর জন্য স্থায়ী চুল্লিটির শিরে একটি প্রাচীরের ঘেরা দেওয়া হয়েছে।

৫. ভুবনডাঙ্গা / শুকনাগোরে শ্মশানকালীতলা ঃ

বর্তমানে ভুবনডাঙায় অবস্থিত শুকনাগোরেশ্মশানকালীতলা প্রথমে ছিল বাঁধগোড়ার কাছে। ১২৮০ বঙ্গাব্দে রত্নের গোস্বামী এর প্রতিষ্ঠাতা । যিনি পঞ্চমুণ্ডী সিদ্ধিলাভ করেন। আনুমানিক ১৩১০-১৫ বঙ্গাব্দে রত্নে র গোস্বামী ভুবনডাঙায় সর্বপ্রথম মাটির ঘর দিয়ে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে কালীমূর্তি মৃন্ময়ী, বিরাটাকৃতি, নৃমুণ্ডমালিনী। পূর্ব ঐতিহ্য মেনে প্রতি বছর অঘ্রাণ মাসের অমাবস্যায় বৈদিক মতে দেবীর অঙ্গরাগ (১৩) হয়। দেবীর নতুন মূর্তির অভিষেকে মোচছব (১৪) হয়। মোচছবের সিংহভাগ ব্যয়ভার বহন করতে হয় গোস্বামী পরিবারকে। এই মোচছবকেকেন্দ্র করে প্রায় হাজার চারেক ভক্তের সমাগম হয়। অবস্থাপন্ন ভক্তেরা স্বেচ্ছায় এই বিপুল খরচেনর ভার বহন করেন। বাস্তবিক ভার বহন করেন। বাস্তবিক শুকনাগোরে দক্ষিণাকালীর মন্দির, মন্দির সংলগ্ন বারান্দা, প্রাচীর এবং এক চুল্লি বিশিষ্ট শ্মশান, সর্বোপরি সমগ্র চত্বরটি ভক্তজনের দাক্ষিণ্যের চিহ্ বহন করছে।

ভুবনডাঙ্গা শুকনাগোরে শ্মশানকালীতলার সঙ্গে গোস্বামী পরিবারের ওতপ্রোত যোগ। রত্নের গোস্বামী ছিলেন এরপ্রতিষ্ঠাতা,শ্মশানের প্রাথমিক জন্ম বাঁধগোড়ার কাছে ছিল। বছর পঞ্চাশেক বা তারও আগেশ্মশান পরিবর্তন হয় ।তারপর এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিলেন রত্নের গোস্বামীর পুত্র মনোহর গোস্বামী। বর্তমানে এর ভার ন্যস্ত আছে তপন গোস্বামীর উপর। দক্ষিণ কালীর নিত্যসেবা করেন তপন গোস্বামী, এছাড়া মঙ্গলবার এবং শনিবার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষে ছোটোখাটো মেলা হয়, তবে সব কিছুকেই ছাড়িয়ে যায় অঘ্রাণের অমাবস্যা। সেই শীত নিশীথে স্বয়ং দক্ষিণাকালী ভর করেন মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তিতে । ছাগবলির রক্তে ভেসে যায় যূপকাষ্ঠ । মন্দির অভ্যন্তরে সাত আট ফুটের বিরাটাকায় কালীমূর্তি জীবন্ত মানুষের মতো থরথর করে কেঁপে উঠে।

৬. নীচুপটি / সতীঘাট মহাশ্মমান ঃ

আনুমানিক সময় ১৯৪০ - ৪৫ সাল। পুরন্দরপুরের মদনগিরি নামে এক শ্রমজীবি সাধারণ মানুষ। দিন - মজুরিতেইযার দিন গুজরান। খেতে - খামারের কাজের পাশে মেহনতি মানুষটিকে মাটি কাটা , পুকুর খোঁড়া কুয়ো কাটার কাজও করতে হত। সাধারন দিনের মতই কাজ চলছিল নিচুপটি বারিপুকুরে। বারিপুকুরে পাঁক তোলার কাজে ব্যস্ত যখন মদনগিরির মত আরো অনেক সেই সময় পাঁকে পোঁতা এক অদ্ভুত দর্শন পাথরে মদনগিরির পা ঠেকে ।সাধারণ গরীব - গুর্বো লোক কূপে কূপে এক অজানা শিহরণ। আর সেইদিন রাত্রেই দেবীর স্বপ্নাদেশ । যদিও তাকেআদেশ না বলে আর্ত চিৎকার বলা ভালো। কে যেন মদনগিরিকে ঠেলা মেরে জাগিয়ে দিল, মদন চোখ কচলে দেখে স্বয়ং দেবী তাকে বলেছেন "আমাকে উদ্ধার করে, ঐ পচা দুর্গন্ধপাঁক থেকে আমাকে তুলে আন, আমি তোর বিটি। (১৫)" দিন মজুরের মাথায় তখন অজস্র পোকার কিলবিলানি, কান ভোঁ ভোঁ, ঘুম গেছে ছুটে। ভোর রাতেই মদন গিরি পাঁক পুকুর থেকে পায়ে ঠেল া লক্ষ্মীকে মাথায় করে নিয়ে এল। দেবীর স্বপ্নাদেশ মত তাকে স্থাপন করা হল নিচুপটির কানন্দর (১৬) ঝিলেরশ্মশানে ।য ার পাশে বয়ে যাচ্ছে সমগ্র বোলপুরের ব্যবহৃত ঝিল।

পরবর্তীকালে সতীমায়ের শিলামূর্তিটিকে সম্মুখে রেখে মা কালীর মৃন্ময়ী মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেন মদন গিরি । মায়েরঅসীম কৃপায় ততদিনে মদন গিরির নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। বর্তমান মদন গিরি জীবিত নেই। সতীঘাট মহাশ্মশানের দায়িত্বে আছে তার তিন ছেলে শিবনাথ, ভোলানাথ, ঝিনাথ। আর মদনগিরি বৈদ্যনাথ মণ্ডল, সঞ্জয় দাসের মত অনেক চ্যালার মধ্য দিয়ে আজও মদনগিরি নামে বন্দিত । সতীমায়ের মন্দিরে মদনগিরির ছবি স্থান পেয়েছে, নিত্যপূজা তারও প্রাপ্য। ঠিকঠাক পুজো না পড়লে গাঁজার ধূমে আর ঘুমের ঘোরে মদনের চ্যালারা খিস্তি খান। মদনের চ্যালাদের মতে তার পুরে া নাম ছিল মুখখিস্তানন্দ মদনগিরি মহারাজ। (১৭) সতীমায়ের পাকা মন্দির, মন্দিরের অনন্য নিষ্ঠা অন্যদেরও জাগিয়েছে। যার ফলস্বরূপ, আজ সতীমায়ের পাকা মন্দির, মন্দির সংলগ্ন নাট মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন বোলপুর হাটতলা পাল জুয়েলার্স -এর মালিক ছবি পাল। বোলপুর মিউনিসিপ্যালিটি ১৯৯৩-এ শ্যামলী ঘোষের তত্ত্বাবধানে নিচুপটির মূলরাস্ত া থেকেশ্মশানভুমি ও মন্দিরচত্বর ইঁট সিমেন্ট বাঁধাই হয়েছে। প্রায়শই দূর দুরান্তের ভক্তদের দান-দক্ষিণা মেলে বর্তমানে মদনগিরির ছেলে ও চ্যালারা তার ঐতিহ্য মেনে আজও সতীমায়ের নিত্যসেবা করে। প্রতি অমাবস্যায় মোচ্ছব হয়। শ চ ারেক নিরন্ন মানুষের পাত পড়ে -- আনন্দ মোচ্ছব (১৮) আখ্যা এর। প্রতি পূর্ণিমায় পায়েস ভোগ হয়। আর প্রতিবছর ক ার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে মৃন্ময়ীর মূর্তিবদল উপলক্ষে সতীমায়ের মেলা বসে। অসংখ্য ঢাকের বাজনা, অজস্র ছ াগবলিতে সমগ্রশ্মশানভূমি মুখরিত হয়। হাজার ভক্তের সমাগমে বাউল ফকির সেবা চলে, চলে আখড়া। এই কাজটিশ্মশ ানচারী মানুষের ভাষায় মহাকাজ ।আর কোনো মহাকাজ একার পক্ষে সম্ভব নয়। দশজনের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দাঁড় ায়।

মূল শ্মশানভূমিটি বিঘা তিনেক হলেও, সতীমায়ের মন্দির, মন্দিরের গা ঘেঁষে পুকুর, শ্মশানের একপাশে বহুদূর বিস্তৃত পতিতজমি মিলে প্রায় ১২ বিঘে জমি সতীমায়ের মালিকানা ।একটি পাকা চুল্লি, প্রায়োজনে বানানো যায় একটি কাঁচা চুল্লি মিলিয়ে মোট দুটি শবদাহের ব্যবস্থা বর্তমান । চুল্লির পাশেই একটি বাঁধানো বেলগাছ, যার তলায় কুকুর শিয়ালের মূর্তি করা আছে। সতীমায়ের অনুচরদের সামনে মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নি করা হয়। এছাড়া দোষ পাওয়া মড়া, অপঘাতে মৃত্যু বা মারা যাওয়ার পর প্রেতের উপদ্রব থেকে বিশুদ্ধ হতে গেলে, এই বেলগাছের তলায় অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা এসে গণনা করে দোষ কাটান। আবার কোন সময়, যে কোন কারণে মৃতদেহ না পাওয়া গেলে,তার উদ্দেশ্যে খড়ের পুত্তলি তৈরি করে, মায়ের অনুচরদের সাক্ষী রেখে সব বিধান মেনে দাহ করা হয়। কোনরকম বাধ্যতামূলকশ্মশানঘাটে জমা নেই। মৃতের পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী মড়া পোড়ানোর অর্থ ভিক্ষা করাহয়।
শ্মশান সংলগ্ন পোড়ো জমির উপর বেশ কিছু সমাধি ফলক ছাড়াই সমাধি চিহ্ন বর্তমান। সেই সমাধিস্থ মানুষের বৈর াগ্য'কে স্মরণ করে, মদনের চ্যালা বৈদ্যনাথ গান বেঁধেছেন----
সতীঘাটে ডাঙার পরে
চার বৈরাগ বাস করে।

প্রথম বৈরাগ সত্যদাস
মা'র দক্ষিণে তার মাঠে বাস
বৈরাগ মধ্যে ঐ তো খাস।
দ্বিতীয় জন ঝোরার মাঠে
গোঁসাই নিরঞ্জন ছড়া কাটে,
ছড়ার বাঁধা প্রেমদাসী
তাঁর বড়ই আপন --- সর্বনাশী
বৈরাগ ছাড়া থাকতে না'রে---
তাই মরার পরে মড়ার ঘাড়ে
বৈরাগ সঙ্গে বসত করে।
ঐ সতীঘাট ডাঙার পরে
চার বৈরাগ বাস করে।
চতুর্থজন দেবেন দাস
ধরায় থাকা ছিল আশ
থাকল না সে পুঁজির জোরে
অবশেষে সতীঘাটে ডাঙার পরে
চার বৈরাগ বসত করে।
মদন গিরি মহারাজও ছিলেন গাইয়ে। গানের মধ্যে দিয়ে তিনি তার পরিচয় বেঁধেছেন----
জেলা মালদহ, আমার বাড়ি
আমি এক ভুতের ব্যাপারী।
বোলপুরে ঠিকানাপটির শেষ
ভূতধরা মন্ত্র নিয়ে ঘুরি নানান দেশ---
ভূতের খাই, ভূতের পরি
ভূতের সঙ্গে বসত করি
আমি এক ভূতের ব্যাপারী।
নিচুপটি সতীঘাট মহাশ্মশান তার পুরানো ঐতিহ্য মেনে সমস্তশ্মশানাচার পালন করে আজও প্রতিটি মানুষের জন্য ঠাঁয় দ াঁড়িয়ে বোলপুর, বাহিরি, এবং ছাতরা, সিয়ান, কীর্ণাহার, কাটোয়া থেকেও মৃতদেহ নিয়ে আসেন তার প্রিয়জনেরা। সতীমায়ের মন্দির অভ্যন্তরে মা কালীর বিশালাকার মূর্তি, সম্মুখে শিলা বিগ্রহ। আর সতীমায়ের ঘাট বলতেসমগ্র বে ালপুর শহরের ব্যবহৃত পচা দুর্গন্ধযুক্ত কালো জলের ধারার মাঝে শান বাঁধানো সিঁড়ি । মদনগিরির চ্যালাদের ভাষায় এ মৃতগঙ্গা, যা নাকি গঙ্গার মত পবিত্র। কেননা গঙ্গার মত মৃত গঙ্গায়ও সমস্ত নোংরা বহন করে চলে।আর কার্তিকের অম াবস্যায় মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তির পরিবর্তনের ঘোর রাতে 'এক পাত ভোগ' ১৯ বাড়িতে হয় সতীঘাটের সোপানতলে। ম ায়ের অনুচর শিয়াল এস কখন চেটেপুটে নিয়ে, সাধারণ চোখে তা দেখা যায় না।
৭. বোলপুর / ভুবনডাঙ্গা কবরস্থান ঃ
পাঁচ একর পঁচিশ শতক অর্থাৎ প্রায় ১৬ বিঘা জমির উপর অবস্থিত বোলপুর ভুবনডাঙা কবরস্থান। বাংলা ১২৪০ বঙ্গ াব্দে ইংরেজি ১৮৩৩ খ্রিঃ এর প্রতিষ্ঠা। ১৭০ বছরের পুরানো কবরস্থানটি দীর্ঘদিন উন্মুক্ত প্রান্তরেই ছিল। পৌষমেলার ম াঠ পরিবর্তনের ২০ কালে, ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদনে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পরবর্তীকালে সমগ্র কবরস্থানটি ছোট পাঁচিলে ঘিরে দেয়। আবদুল সালাম জানান, সমগ্র গোরস্থানটির সংরক্ষণের পরিচালনায় তৈরি আছে বোলপুর ভুবনডাঙ্গা মুসলিম কমিটি। দশ বারোটি সমাধি ফলক বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভুবনডাঙা কবরস্থান । ভুবনডাঙা, বাঁধগোড়া, দর্জিপাড়া, হাটতলা, টিকাপাড়া, শ্যামবাটি, শান্তিনিকেতনের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মৃতদেহ গোর দেওয়া হয়

এই কবরস্থানে । ১৭০ বছরের পুরানো কবরস্থানটি ঐতিহ্যে ও গাম্ভীর্যে অনন্য ভূমিকা পালন করে দীর্ঘকাল। সমগ্র কবরস্থানটি পাঁচিলে ঘেরা এবং অভ্যন্তরে ছোট একটি স্থান পাঁচিলের আবেষ্টনীতে বাঁধানো। স্থানটি ঈদগাঁও মসজিদ। যেখানে পূর্বপুরষের আত্মার উদ্দেশ্যে জানাজ পড়া হয়। তাছাড়া ইদুজ্জোহার সময় ইত্বকরিত নামাজ পড়া হয়। সমগ্র কবরভুমিটির উন্নয়ন প্রকল্প অর্থাৎ পর্যাপ্ত জল সরবরাহ, প্রয়োজনীয় বিদুৎ,এবং একটি ছাউনি নির্মাণের জন্য ভুবনডাঙা মুসলিম কমিটি বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা ভেবেছে।

৮. গোরা শ্মশান / আত্মার শান্তি নিকেতন ঃ

জীবিত মানুষই জাতের বড়াই করে আর জতের নামে বজ্জাতি'ও করে। মড়ার কোন জাত নেই। না হিন্দু না মুসলমান। না রাজা, না ভিখিরি। রক্তমাংস বাদে প্রায় সব কঙ্কাল এক গঠনগ্রন্থিতে বাঁধা। হিন্দুর ক্ষেত্রে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া এবং মুসলমানের ক্ষেত্রে মাটিতে বিলীন হয়ে যাওয়ার দুটি স্থান শ্মশান এবং গোর উদারভূমির এক আশ্চর্য লোক । সে লোকে জাতপাতের (২১) নিয়ম নেই। নেই অর্থের জারিজুরি । এক বিশঙ্খল পবিত্রতা বিরাজ করে।শ্মশানচারী বা গোরভূমি আঁকড়ে পড়ে থাকা জীবিত মানুষগুলিও মৃতের ভাষা মুখস্থ করে ফেলেছেন, আত্মস্থ করেছেন মৃত্যু নাম অনিবার্য শব্দটি, শুধুমাত্র যে কোন সময় ছোঁয়ার অপেক্ষায় । বড় দীর্ঘকাল শীত, গ্রীষ্মকে দমন করে শরীরী ভাষা গেছে পাল্টে, মনের অন্তকরণে গড়ে উঠেছে এক আশ্চর্য দর্শন। যে জীবনদর্শনের মুখোমুখি হতে সাধারণ মানুষ ভয় পাবে। আর যে মানুষ এই অসাধারণ লোকের সন্ধানে যাবে, সে অতলে যাবে তলিয়ে । গোরশ্মশান জগৎ, যার অদূরেই অমরাবতী মাঝে মৃত্যু নামক এক অমোঘ আবরণ।

পাদটীকা ঃ

১. ঠাকুর -- কথিত আছে জনৈকা রানীমা নাকি সুদূর চীনদেশ থেকে তারা মার এক পাষাণ মূর্তি সর্বপ্রথম তারাপুরে প্রতিষ্ঠা করেন।

২. বামার চ্যালা --- এখানে চ্যালা শব্দের অর্থ সাঙ্গোপাঙ্গ, সঙ্গীসাথী, বলা যায় খণ্ডশিষ্য, সতীর্ত।

৩. নাভিকুণ্ড উদ্ধার ---মানুষের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পরও নাভিকুণ্ডলী পোড়ে না, পরে গঙ্গায় আত্মার শান্তিতে অনেকেই এই নাভিকুণ্ড ভাসিয়ে দেন।

৪. ঝিল --- প্রায় অধিকাংশ শ্মশান জল কেন্দ্রিক - জলাশয়ের কাছাকাছি মাটির লম্বা গর্ত কেটে চুল্লি বানানোর সমগ্র জায়গাটি ঝিল নামে পরিচিত

৫. ভারি--- আগুনের তাপে, মৃতদেহের চামড়ায় টান লাগে, দেহ কুঁকড়ে যায়, মনে হয় মড়া খাড়া হয়ে উঠবে, সে কারণে মড়ার ঘাড়ে, তলপেটে এবং গোড়ালিতে মোটা কাঠ দেওয়া হয়, এর নামে ভারি বা গড়ই।

৬. 'শ ---মৃতদেহ নিচে এবং উপরে সমগ্র কাঠ সজ্জাটিকে শ' নামে ডাকা হয়।

৭. কুণ্ডু --- ছোট পুকুর।

৮. মানত--কোন বিশেষ ইচ্ছাপূরণের জন্য দেবতার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। স্থানীয় ভাষায় মান্নিক বলে।

৯. পাটুলি --- মৃতদেহ সৎকারের অগ্রণী যে, ডোমের কাজ।

১০. এখানে পাকা মড়া পূর্ণবয়স্ক মানুষের মৃত্যু এবং খাঁচামড়া অকাল মৃত্যুকেই ইঙ্গিত করেছে। এবং তার ফলস্বরূপ দুটি ভিন্ন পাওনা।

১১. প্রতিটি শ্মশানেই চুল্লিও পূজ্য। মা কালীর সঙ্গে চুল্লিতেও পুজো দেওয়া হয়।

১২. চুল্লির সামনে, শবদাহী ছাউনির দেওয়াল লেখা--- 'আপনাকে আমার শেষ প্রণাম।' সুশান্ত অমর রহে।'তোর মৃত্যুর আমরা বদলা নেব'। আপনাকে শেষ কথা বলা হল না', 'ওগো অপেক্ষা কর, তোমার আশা পূর্ণ হবে।' ---এহেন বিবিধ বাক্য চারকোলে লিখেছে মৃতের পরিজনেরা।

১৩. শোনা যায় রেললাইন খননকালে কালীসায়ের স্থলে, একটি পাথর কিছুতেই তোলা যায় না, পাথরকাটা যন্ত্রও ব্যর্থ হয়। সেই পাথরই আজকের কালীসায়ের মহাকালীর পাষাণী রূপ।

১৪. অঙ্গরাগ, যদিও মূর্তিতে নতুন রঙ বা পালিশ বোঝায়, আবার একেবারে নতুন মূর্তির ক্ষেত্রে অঙ্গরাগ বলা হয়।
১৫. ‘মোচ্ছব’ --- বহু দুঃস্থ, দরিদ্র মানুষের একসঙ্গে ভোজ, কাঙাল ভোজন।
১৬. বিটি---মেয়ে। মদন গিরি নিজেকে সীতামায়ের ‘বাপ’ বলে দাবি করত।
১৭. কান্দর --- কন্দর, গর্ত।
১৮. অতিরিক্ত গাঁজা এবং মাদক সেবনে, সম্ভবত কোন স্নায়ুগত পরিবর্তনে, শ্মশানচারী কাপালিক গোত্রের মানুষরা প্রায়শই গালিগালাজ দিয়ে থাকেন।
১৯. আনন্দমোচ্ছব---বৃহৎ ভোজ, জাতপাতহীন এক পংক্তির অন্নগ্রহণ।
২০. সতীঘাটের সোপানে এক পাত নৈবেদ্য বাড়তে হয়, রাতের শেয়াল এসে তা খেয়ে যায়। (প্রসঙ্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পুষ্করা’ গল্পের কথা মনে পড়ে)।
২১. প্রথম পৌষমেলার মাঠ ছিল কাচমন্দিরের বিপরীতে।
২২. গুসকরার কাছে দিকনগর শ্মশানে দু’ভাগ, জাতের বিচারে, এই একবিংশ শতাব্দীতেও।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার --- বাবলু প্রামাণিক, শান্তদা, গোরা, ভবানীদি, শান্তশ্রী এবং বুবাই।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com